মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

ভূগোল ও পরিবেশ

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	L	২	K	৩	N	৪	K	৫	L	৬	M	৭	M	৮	L	৯	K	১০	M	১১	M	১২	N	১৩	N	১৪	K	১৫	K
১৬	L	১৭	M	১৮	M	১৯	N	২০	M	২১	N	২২	N	২৩	M	২৪	N	২৫	N	২৬	K	২৭	N	২৮	K	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক ম্যাকনির মতে, "ভৌত ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবনধারা নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাই ভূগোল।"

খ নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ ভূগোলের মানব ভূগোল শাখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চরে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কীভাবে বসবাস করছে, কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কেন এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তার কার্যকারণ অনুসন্ধান মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। ভূগোলের এ শাখায় নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ, নগর ও শহরের শ্রেণিবিভাগ, নগর পরিবেশ, নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা, নগরীর বস্তি ইত্যাদি বিষয় চর্চা করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' বিভাগের উপাদানগুলো প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

ভূগোলের যে শাখায় ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। পৃথিবীর ভূমিরূপ, এর গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

উদ্দীপকের 'ক' বিভাগে পৃথিবীর ভূমিরূপের গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জলবায়ু উল্লেখ করা হয়েছে। যা প্রাকৃতিক ভূগোলকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানব ভূগোল, উভয় বিভাগের উপাদানগুলোই মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

মানুষ পৃথিবীতে বাস করে এবং এই পৃথিবীতেই তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী, নদ-নদী, সাগর, খনিজ সম্পদ তার জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তার ক্রিয়াকলাপ তার পরিবেশে ঘটায় নানান রকম পরিবর্তন। পরিবেশে যেমন ভূমি, জীব ও মৃত্তিকার প্রয়োজন রয়েছে; তেমনি সম্পদ, খনিজ সম্পদ মানবজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে।

মানবজীবনে প্রাকৃতিক ভূগোলের আওতাভুক্ত পৃথিবীর ভূমিরূপ, এর গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানবজীবনে চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমিরূপ, প্রাণী এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তদ্রুপ মানব ভূগোলে কৃষিকাজ, পশুপালন কাজ, সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, মানবজীবনে 'ক' ও 'খ' উভয় বিভাগের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট দিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বলে।

খ ঝড়ের আগাম তথ্য জানার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার হয়।

মানুষের তৈরি বিভিন্ন উপগ্রহ আছে যারা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এদের বলে কৃত্রিম উপগ্রহ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, তথ্য আদান প্রদান, গোয়েন্দা নজরদারি, খনিজ সম্পদের সন্ধান, পরিবেশ দূষণ নির্ণয় ইত্যাদি কাজে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'R' চিহ্নিত গ্রহটি হলো মঙ্গল গ্রহ।

মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী গ্রহ। বছরের অধিকাংশ সময় একে দেখা যায়। খালি চোখে মঙ্গল গ্রহকে লালচে দেখায়। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। এ গ্রহে দিনরাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে এ গ্রহটির সময় লাগে ৬৮৭ দিন।

মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এ গ্রহে অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ খুবই কম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি (শতকরা ৯৯ ভাগ) যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। মঙ্গলে ফোবস ও ডিমোস নামে দুটি উপগ্রহ রয়েছে।

ঘ 'P' ও 'Q' চিহ্নিত গ্রহ দুটি হলো যথাক্রমে বৃহস্পতি ও পৃথিবী। এ দুটি গ্রহের মধ্যে 'Q' গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

'Q' গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা রয়েছে যা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে।

অপরদিকে 'P' গ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে তাপমাত্রা খুবই কম এবং অভ্যন্তরে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি (প্রায় ৩০,০০০° সেলসিয়াস)। এ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব নেই। সৌরজগতের পৃথিবী গ্রহ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রহে প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সহনীয় মাত্রায় নেই।

সুতরাং 'Q' গ্রহে জীবের বেঁচে থাকার উপযোগী পরিবেশ বা উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু 'P' গ্রহে জীবের বেঁচে থাকার উপযোগী উপাদান বা পরিবেশ নেই। তাই 'Q' গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জিআইএস (GIS) বলে।

খ দেশের আয়তনের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ সময় একাধিক হতে পারে।

আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রে ৪টি এবং কানাডাতে ৬টি প্রমাণ সময় রয়েছে। সেসব দেশগুলোর প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য তারা একাধিক প্রমাণ সময় ব্যবহার করছে।

গ চিত্রে : ২ হচ্ছে ক্যাডাস্ট্রাল বা মৌজা মানচিত্র। এ মানচিত্রের স্কেল হবে ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল বা ৩২ ইঞ্চিতে ১ মাইল।

মৌজা মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ভূমি অথবা ভবনের মালিকানার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য। আমাদের দেশে আমরা যে মৌজা মানচিত্রগুলো দেখতে পাই সেগুলো আসলে ক্যাডাস্ট্রল মানচিত্র। এই মানচিত্রের মাধ্যমেই হিসাব করে সরকার ভূমির মালিক থেকে কর নিয়ে থাকে। এছাড়া এ মানচিত্রে নিখুঁতভাবে সীমানা দেওয়া থাকে। যার ফলে আমরা সহজেই একে অপরের সম্পত্তিকে শনাক্ত করতে পারি। এই মানচিত্রগুলো বৃহৎ স্কেলে অঙ্কন করা হয়, যা ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল বা ৩২ ইঞ্চিতে ১ মাইল। এই ধরনের মানচিত্রের মধ্যে বিবিধ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

উদ্দীপকের চিত্র : ২ এর B মানচিত্র বিষয়ে বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে সরকার ভূমি কর নেয়। তাই বলা যায়, B মানচিত্রটি হচ্ছে ক্যাডাস্ট্রাল বা মৌজা মানচিত্র।

ঘ চিত্র : ১ ও চিত্র : ৩ এর মানচিত্র অর্থাৎ ভূসংস্থানিক ও দেয়াল মানচিত্রের মধ্যে ভূসংস্থানিক মানচিত্র একজন ভ্রমণকারীর জন্য সুবিধাজনক বলে আমি মনে করি।

ভূসংস্থানিক মানচিত্র প্রকৃত জরিপকার্যের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত এর মধ্যে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দুই ধরনের উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের মানচিত্রের স্কেল একেবারে ছোট না হলেও মৌজা মানচিত্রের মতো বৃহৎও নয়। এই মানচিত্রগুলোতে কিন্তু জমির সীমানা দেখানো হয় না। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাহাড় মালভূমি, সমভূমি, নদী, উপত্যকা, হ্রদ প্রভৃতি দেখানো হয়। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হিসেবে রেলপথ, হাটবাজার, পোস্ট অফিস, সরকারি অফিস, খেলার মাঠ, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি নিখুঁতভাবে দেখানো হয়। তাই আমি মনে করি, এই মানচিত্রটি একজন ভ্রমণকারীর জন্য সুবিধাজনক। কেননা সকল কিছুর দিক নির্দেশনা ভ্রমণকারী এখানে খুঁজে পাবে।

অন্যদিকে, দেয়াল মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার জন্য। সারাবিশ্বকে অথবা কোনো গোলার্ধকে এই মানচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। দেয়াল মানচিত্রে আমাদের চাহিদা মতো একটি দেশ অথবা একেকটি মহাদেশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয় বড় অথবা ছোট স্কেলে। যা একজন ভ্রমণকারীর জন্য ভূসংস্থানিক মানচিত্রের মতো সুবিধাজনক নয় বলে আমি মনে করি।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ।

খ আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় দুর্বল অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। এভাবে ব্যাসল্ট শিলার সৃষ্টি হয়। ব্যাসল্ট একটি আগ্নেয় শিলা। আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয় এবং এ শিলা থেকে অন্যান্য শিলা গঠিত হয়েছে, তাই এ শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলা হয়। সে হিসেবে ব্যাসল্ট শিলাও প্রাথমিক শিলা।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ সুনামির কারণে আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল।

সুনামি হলো পানির এক মারাত্মক ঢেউ যা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল হ্রদে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানির নিচে কোনো পারমাণবিক বা অন্য কোনো বিস্ফোরণ, ভূপাত ইত্যাদি কারণেও সুনামি হতে পারে। সুনামির পানির ঢেউ সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের মতো নয়। এটা সাধারণ ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বিশালাকৃতির। অতি দ্রুত ফুঁসে ফুলে ওঠা জোয়ারের মতো যা উপকূল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। সুনামির ক্ষয়ক্ষতি সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আশেপাশে সুনামির ধ্বংসাত্মক লীলা সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ নাফিসা ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফি চ্যানেলের এক প্রতিবেদনে দেখল, ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে একটি মারাত্মক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে আশেপাশের অনেকগুলো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুনামিকে নির্দেশ করে এবং সুনামির কারণে আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর পরিবর্তন প্রক্রিয়া অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির ফলে শুধু মানুষের অপকার নয়, উপকারও হয়– উক্তিটি যৌক্তিক।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম, নগর, কৃষিখেতের সব ধ্বংস করে। ১৮৭৯ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই নামের দুটি নগর উত্তপ্ত লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। আগ্নেয়গিরির কারণে কেবল মানুষের অপকার নয় উপকারও হয়ে থাকে। এতে ভূমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমন- দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণমৃত্তিকা কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় লাভার সঙ্গে অনেক খনিজ পদার্থ নির্গত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে অগ্ন্যুৎপাতের জন্য অধিক পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অগভীর সমুদ্রে বা হ্রদে লাভাও ভস্ম সঞ্চিত হয়ে এরূপ ভূভাগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া লাভা পাথর দিয়ে বড় বড় দালানকোঠা এবং রাস্তাঘাট তৈরি হয়। যা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য সহায়ক।

তাই বলা যায়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে শুধু মানুষের অপকার নয়, উপকারও হয়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকাই হলো কাম্য জনসংখ্যা।

খ মানুষ যখন প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করে তা প্রয়োগ করতে পারে তখন ঐ জনসংখ্যাই জনসম্পদে পরিণত হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশের লোকেরাই কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ। কারণ এ জ্ঞানকে তারা কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। যেমন– চীন দেশে অধিক জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও তারা কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ হওয়ায় এরা জনসম্পদে পরিণত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের উখিয়ায় আশ্রয়গ্রহণ বলপূর্বক আন্তর্জাতিক অভিগমন।

মানুষ যখন এক দেশ থেকে অন্যদেশে অভিগমন করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে। এ ধরনের অভিগমন আকর্ষণমূলক কারণ ও বিকর্ষণমূলক কারণে হতে পারে। যেসব উপাদান স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যদেশে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে তাকে বিকর্ষণজনিত কারণ বলে।

উদ্দীপকের মিয়ানমার থেকে অনেক মুসলমান সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়। সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাৎ বিকর্ষণমূলক কারণে নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্যদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অভিগমন করে। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা বলপূর্বক আন্তর্জাতিক অভিগমনের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ মিয়ানমার থেকে মুসলিম রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারের উখিয়ায় অভিগমনের ফলে ঐ অঞ্চলের পরিবেশের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়ে।

রোহিঙ্গাদের অভিগমনের ফলে এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনবৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব অঞ্চলে ভূমি ও সম্পত্তির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়, জীবনযাত্রার মান নিম্ন হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার ফলে রোহিঙ্গাদের দুর্ভোগই বেশি হয়। রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারে প্রবেশের ফলে এ অঞ্চলে সামাজিক ও আচার-আচরণের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা হচ্ছে। এর দ্বারা সামাজিক অনেক রীতিনীতি একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রোগের বিস্তার ঘটছে। অধিক হারে রোহিঙ্গাদের প্রবেশের ফলে এ অঞ্চলে ঐ দেশের সংস্কৃতি রপ্ত করার কারণে নিজের দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমনকি বিভিন্নভাবে মানুষ অপরাধ চক্রের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা অভিবাসনের ফলে মিয়ানমারে তথা উৎসস্থলে জনসংখ্যা কমছে এবং বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া তথা গন্তব্যস্থলের মোট জনসংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষিত, যুবক ও পেশাজীবী অভিবাসন করলে গন্তব্যস্থলে জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে উভয় স্থানের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত ও নির্ভরশীলতার অনুপাত ব্যাপক হারে পরিবর্তিত হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারে আগমন ঐ অঞ্চলে সার্বিক পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে কেন্দ্রীয় শহরকে রাজধানীর রূপ দেওয়া হয় এবং যেখানে পৌর বসতির প্রসার ঘটে তাকে প্রশাসনিক নগর বলে।

খ পদ্মা নদীর তীরে রৈখিক বা দণ্ডাকৃতি বসতি গড়ে উঠেছে। রৈখিক বসতিতে বাড়িগুলো একই সরলরেখায় গড়ে ওঠে।

প্রধানত প্রাকৃতিক এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক কারণ এই ধরনের বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীর কিনারা, রাস্তার কিনারা প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। এই অবস্থায় গড়ে ওঠা পুঞ্জীভূত রৈখিক ধরনের বসতিগুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁকা থাকে। এই ফাঁকা স্থানটুকু ব্যবহৃত হয় খামার হিসেবে। বন্যামুক্ত সমস্ত উচ্চভূমি এই ধরনের বসতির জন্য সুবিধাজনক।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত নগরটি হলো সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপভিত্তিক নগর।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে যে নগর গড়ে ওঠে তাকে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপভিত্তিক নগর বলে। চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র শিল্প ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে মূলত এ সকল নগর গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের প্যারিস চিত্রকলা, ভারতের মুম্বাই ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ মিজান ভারতের একটি নগরে বেড়াতে গেল, যেটি চলিচ্চত্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। এ নগরটি চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত বলে এটি একটি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপভিত্তিক নগর।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত বসতি দুটি হলো গ্রামীণ বসতি এবং নগর বসতি।

এ দুই বসতির মধ্যে নগর বসতিতে নাগরিক সুবিধা বেশি।

শহর এলাকায় মানুষ কৃষিভিত্তিক পেশা পরিত্যাগ করে শিল্পভিত্তিক পেশায় আত্মনিয়োগ করে। শহর অঞ্চলের জনগোষ্ঠী শিক্ষাদীক্ষায় আধুনিক এবং এখানে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড তথা শিল্পায়ন দ্রুততর বৃদ্ধি পেতে থাকে যে কারণে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিরাজ করে। তাই সেখানকার বসতিগুলোতে ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া শহরের মানুষ পাকা বাড়ি বা অট্টালিকায় বসবাস করে। শহরের বসতির মধ্যে নাগরিক সুবিধা বেশি এবং উন্নত জীবনযাপন পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে, গ্রামে প্রচুর জমি থাকে। স্বভাবতই গ্রামবাসীরা খোলামেলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারেন। শহরের ইট-সিমেন্টের নির্মাণ স্থাপনা থেকে গ্রামের মাটির, কাঠের, পাথরের বাড়িকে সহজেই আলাদা করা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রামে গোলাবাড়ি, গোয়ালবাড়ি, ঘরের ভিতরে উঠান এসবই এক অতি পরিচিত দৃশ্য। গ্রামে উঠানের চারপাশে ঘিরে শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর তৈরি করা হয়। উঠানে গৃহস্থরা ধান সেদ্ধ করা, শুকানো এবং ধান ভাঙা ছাড়াও নানান কাজ করে থাকে। গ্রামে শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর আলাদাভাবে গড়ে ওঠে যা শহরে হয় না। গ্রামীণ বসতিতে নগর বসতির ন্যায় নাগরিক সুবিধা নেই।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের মামুনের বসতি এবং রশিদের বসতি অর্থাৎ গ্রামীণ বসতি এবং শহর বসতির মধ্যে শহর বসতিতে নাগরিক সুবিধা বেশি।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

খ বসতি বা বসবাস স্থাপনে জলবায়ু প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

যে সমস্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত সূর্যতাপ পাওয়া যায় ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় সেসব জায়গা বসবাসের জন্য অনুকূল। এরূপ স্থানে কৃষির বিস্তার ঘটে। ফলে অধিক জনবসতি গড়ে ওঠে। যেমন– বাংলাদেশ, ভারত, ও স্পেন। আর, দুর্গম মরু বা মেরু অঞ্চল অথবা অধিক তাপ বা শৈত্যপ্রবাহবিশিষ্ট অঞ্চলে বসবাস কষ্টসাধ্য বলে বসতি কম গড়ে ওঠে (যেমন– সাইবেরিয়া)। তাই বলা যায়, বসবাস স্থাপনে জলবায়ু প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের মামুন সাহেবের কাজ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে। প্রকৃতি এ বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। প্রকৃতির এ অবদান মানুষ পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করে। পশু শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই, পশুপালন, খনিজ উত্তোলন এবং কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকে জনাব মামুন সাহেব একজন সৎ মানুষ। তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। তাই তিনি প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। সুতরাং মামুন সাহেবের কাজ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ রাজুর কাজ দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সাজুর কাজ তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। নিচে উভয় কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। খনিজ লৌহ আকরিক উত্তোলন করে তা থেকে লোহাশলাকা, পেরেক, টিন, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করা হয়। যেমন– উদ্দীপকে রাজু যে কারখানায় কাজ করে সেখানে নতুন নতুন পণ্য তৈরি করা হয়।

অন্যদিকে, তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্তাংশ ঘাটতি অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এটা সম্ভবপর হতে পারে ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদির মাধ্যমে। পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, পরিবেশক, এজেন্ট, ব্যাংকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, আইনজীবী, ধোপা, নাপিত, রিকশাচালক ও ঠেলাগাড়িওয়ালা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার জনসমষ্টির কার্যাবলি তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। যেমন– উদ্দীপকে সাজু আইন পেশায় নিয়োজিত।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত বাংলাদেশে নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে।

খ বাংলাদেশের আয়তন দক্ষিণ দিকে বেড়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৬-৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন ৯,৪০৫ বর্গকিলোমিটার। বনাঞ্চলের আয়তন ২১,৬৫৭ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠেছে। ভবিষ্যতে দক্ষিণ অংশের প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের আয়তন আরও বৃদ্ধি পাবে।

গ মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত স্থানটি হলো মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়। এটি প্লাইস্টোসিনকালের সোপান অঞ্চলের অন্তর্গত।

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে। উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিচে এসব উচ্চভূমির বর্ণনা দেওয়া হলো–

i. বরেন্দ্রভূমি : দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।

ii. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।

iii. লালমাই পাহাড় : কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

ঘ মানচিত্রে 'B' হলো সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি এবং 'C' হলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ। 'B' ও 'C' চিহ্নিত স্থান দুটির মধ্যে 'B' স্থানটি বসবাসের জন্য আমি পছন্দ করব।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এসব পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চল তথা 'C' অঞ্চল মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়।

অন্যদিকে, টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোট-বড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমভূমির ওপর দিয়ে এসব নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ ভূমি উর্বর হওয়ায় কৃষির জন্য যেমন উপযুক্ত; তেমনি শিল্পকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত স্থান।

সুতরাং 'B' ও 'C' স্থান দুটির মধ্যে 'B' স্থানটি অর্থাৎ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বসবাসের জন্য উপযোগী বলে আমি মনে করি।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে।

খ চা চাষের জন্য উঁচু ও ঢালু জমি প্রয়োজন। চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। ১৬° থেকে ১৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে চা চাষ ভালো হয়।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সিলেটের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল ও আর্দ্র। সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও ঢালু ভূমির কারণে পানি জমে না। চা বাগান তৈরির জন্য এ ধরনের ভূমিই বেশি উপযোগী। তাই বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চা চাষ ভালো হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ড' ফসলটি হলো ধান।

১৬° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১০০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় ধানের ফলন ভালো হয়। পলিমাটি সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় ধান চাষ ভালো হয়। তাই নদী অববাহিকায় পলিমাটি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এ জন্য বাংলাদেশের সর্বত্রই ধান জন্মে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে এটিই প্রধান। এদেশে আউশ, আমন, বোরো প্রভৃতি ধরনের ধান চাষ হয়। তবে রংপুরে আমন ধান ও সিলেটে বোরো ধানের ভালো ফলন হয়।

উদ্দীপকের 'ড' ফসলটি উৎপাদনে পলিমাটি এবং ১৬°–৩০° তাপমাত্রা প্রয়োজন। এ ধরনের মাটি ও তাপমাত্রায় ধান উৎপাদন করা হয়। সুতরাং 'ড' ফসলটি হলো ধান।

ঘ উদ্দীপকে 'ট' ও 'ঠ' চিহ্নিত ফসল দুটি হলো পাট ও গম। পাট বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের উর্বর দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক। সাধারণত গম চাষের জন্য ১৬° থেকে ২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এ কারণে বাংলাদেশে বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে পানিসেচের মাধ্যমে সর্বত্র গম চাষ ভালো হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশে যে পরিমাণ গমের চাহিদা তা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দ্বারা মিটাতে পারে না। ফলে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে গম আমদানি করতে হয়। সে জন্য গম অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না।

অন্যদিকে, পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা (২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস) এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের (১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার) প্রয়োজন হয়। নদীর অববাহিকায় পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক। পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো পাট, যা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করা হয়। এ ফসলটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। পাট দ্বারা কার্পেট, চট, বস্তা, পাটের থলে, দড়ি, ব্যাগ, স্যান্ডেল, ম্যাট, পুতুল, শোপিস, জুটন প্রভৃতি তৈরি হয়। এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তাছাড়া কাঁচাপাট রপ্তানি করা হয়। পাট শিল্প স্থাপনের ফলে দেশের বেকার সমস্যা লাঘব হয়েছে। দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে পাটকলের সংখ্যা ২০৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিশর, কানাডা, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের পাট শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা।

সুতরাং বলা যায়, সার্বিক বিবেচনায় গমের চেয়ে পাট ফসলটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যম এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে যাতায়াত ব্যবস্থা বলে।

খ সমুদ্রপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য দেশের পার্শ্বে অবশ্যই সমুদ্রের অবস্থান দরকার। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না, তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে। বন্দর গড়ে উঠলে তবেই সমুদ্রপথ উন্নতি লাভ করবে। আধুনিক বন্দর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়। তাই সমুদ্রপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পোতাশ্রয় ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'B' চিহ্নিত পথটি নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

স্বাভাবিকভাবেই নদীবহুল অঞ্চলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সহজে গড়ে ওঠে না। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথই বেশি ব্যবহৃত হয়।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবছর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত পথটি নৌপথ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'A' ও 'C' পথ দুটি হলো সড়কপথ ও রেলপথ। এ দুটি পথের মধ্যে সড়কপথ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

সমতল ভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার ওপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়। বাংলাদেশের সড়কপথগুলো বসতির বিন্যাসের উপর নির্ভর করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ সড়ক স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নৌপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই সড়কপথ বিদ্যমান।

অপরদিকে উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে রেলপথ নেই বললেই চলে। মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

উদ্দীপকে 'A' যোগাযোগ ব্যবস্থা সমতল ভূমি, মাঝেমধ্যে পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু 'C' যোগাযোগ ব্যবস্থা কেবল সমতল ভূমিতে গড়ে ওঠে। 'C' পথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় কম হয়। সে তুলনায় 'A' পথ অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিকে দুর্যোগ প্রশমন বলে।

খ দুর্যোগ পূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো।

দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ পৌছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ আসলামের এলাকায় সংঘটিত দুর্যোগটি হলো খরা।

দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে খরা বলে। অনেকদিন বৃষ্টিহীন অবস্থা থাকলে অথবা অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে মাটির আর্দ্রতা কমে যায়। সেই সঙ্গে মাটি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা কোমলতা হারিয়ে রুক্ষরূপ গ্রহণ করে খরায় পরিণত হয়।

ঘটনা-১ এ আসলাম দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি জেলায় বসবাস করে। এখানে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃতি রুক্ষরূপ ধারণ করে এবং অগ্নিকান্ডের তান্ডব বেড়ে যায়, যা খরার প্রভাবেই হয়ে থাকে। খরার প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষি জমি কমে যায়। খাদ্যাভাব দেখা দেয় ফলে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। উপদ্রুব অঞ্চলে পানির তীব্র সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন অসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাপদাহে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে। কর্মব্যস্ত মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে পরিবেশ রুক্ষ হয়ে উঠে এবং অগ্নিকান্ডের তান্ডব বেড়ে যায়।

ঘ ঘটনা ১ ও ২ এ সংঘটিত দুর্যোগসমূহ হলো খরা এবং বন্যা। এ দুই ধরনের দুর্যোগের মধ্যে বন্যাই অধিকতর ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে খরার প্রভাবগুলো হলো−

আমাদের দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খরার প্রভাবে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন কমে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উপদ্রুত অঞ্চলে পানির অভাব দেখা দেয়। প্রচণ্ড উত্তাপে বিভিন্ন ধরনের অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিবেশ রুক্ষ হয়ে ওঠে। অগ্নিকান্ডের উপদ্রব বেড়ে যায়। বৃষ্টিহীন ও খরাযুক্ত পরিবেশ মানুষ ও জীবজগতের স্বাভাবিক কাজকর্মের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। প্রতি বছরই বর্ষায় উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যায় এলাকা প্লাবিত হয়ে বিপুল পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয়। মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পশুপাখির জীবন বিনষ্ট ও বিপন্ন হয়। ধ্বংস হয় সম্পদ।

২০০০ সালের বন্যায় দেশের ১৬টি জেলার ১.৮৪ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনস্ট হয়। উৎপাদন আকারে এ ক্ষতির পরিমাণ ৫.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন। এক কথায় আমরা বলতে পারি বন্যার ফলে বাংলাদেশ প্রতি বছর অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশ তথা এ ঢালু সমভূমির দেশে বিভিন্ন শতাব্দীতে বন্যা হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ সালের ছিল ভয়াবহ। এর মধ্যে ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় সবচেয়ে বেশি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে বাংলাদেশে পঞ্চাশের দশকের পর বড় ধরনের কোনো খরা হয়নি। উপরন্তু খরা মানুষকে সহায়সম্বলহীন ভিটে-মাটি ছাড়া করে ভাসমান মানুষে পরিণত করে না। ফলে মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে না। এমনকি পূর্ব থেকে সার্বিক প্রস্তুতি নিলে খরা মোকাবিলা করাও সহজ।

পরিশেষে বলা যায় একটি দেশে খরা ও বন্যা উভয়ই ক্ষতিকর হলেও ব্যাপক অর্থে বন্যার ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	M	২	K	৩	L	৪	M	৫	N	৬	L	৭	M	৮	N	৯	L	১০	K	১১	K	১২	M	১৩	L	১৪	K	১৫	N
১৬	L	১৭	K	১৮	M	১৯	N	২০	L	২১	K	২২	N	২৩	M	২৪	L	২৫	K	২৬	M	২৭	N	২৮	N	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও মানুষের মিথস্ক্রিয়া অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করাকেই ভূগোল বলে।

খ জীব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব ও প্রাকৃতিক অবস্থাই পরিবেশ।
প্রকৃতির সকল উপাদান মিলেমিশে তৈরি হয় পরিবেশ। নদীনালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, উদ্ভিদ, প্রাণী, মাটি ও বায়ু নিয়ে গঠিত হয় পরিবেশ।

গ 'খ' বিভাগের উপাদানগুলো মানব ভূগোলের অন্তর্গত।
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কীভাবে বসবাস করছে, কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কেন এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তার কার্যকর অনুসন্ধান মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।
মানব ভূগোলে জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি, তার কার্যকারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর এর প্রভাব, অঞ্চলভেদে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মানুষ ও মানুষের জীবনধারণ প্রণালি, যাতায়াত ব্যবস্থা, রাজনৈতিক বিবর্তন, রাজনৈতিক বিভাগ ও পরিসীমা এবং বিভাগের মধ্যস্থিত ভৌগোলিক বিষয়, নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ, নগর ও শহরের শ্রেণিবিভাগ, নগর পরিবেশ, নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা, নগরীর বস্তি ইত্যাদি বিষয় চর্চা করা হয়।

ঘ মানবজীবনে 'ক' ও 'খ' বিভাগের উপাদানগুলো যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
মানুষ পৃথিবীতে বাস করে এবং এই পৃথিবীতেই তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী, নদ-নদী, সাগর, খনিজ সম্পদ তার জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তার ক্রিয়াকলাপ তার পরিবেশে ঘটায় নানান রকম পরিবর্তন। পরিবেশে যেমন ভূমি, জীব ও মৃত্তিকার প্রয়োজন রয়েছে; তেমনি রাজনৈতিক অবস্থান, জনসংখ্যা এবং নগর মানবজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে।
মানবজীবনে প্রাকৃতিক ভূগোলের আওতাভুক্ত পৃথিবীর ভূমিরূপ, এর গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানবজীবনে চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমিরূপ, প্রাণী এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তদ্রুপ মানব ভূগোলে রাজনৈতিক বিবর্তন, রাজনৈতিক বিভাগ ও পরিসীমা এবং বিভাগের মধ্যস্থিত ভৌগোলিক বিষয়, জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি, তার কার্যকারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর এর প্রভাব, নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ, নগর ও শহরের শ্রেণিবিভাগ, নগর পরিবেশ, নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা, নগরীর বস্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।
সুতরাং মানবজীবনে 'ক' ও 'খ' উভয় বিভাগের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব জ্যোতিষ্ক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়, এদের উপগ্রহ বলে।

খ বৃহস্পতিকে গ্রহরাজ বলা হয়।
কারণ, বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। এর ব্যাস ১, ৪২, ৮০০ কিলোমিটার। আয়তনে এটি পৃথিবীর চেয়ে ১,৩০০ গুণ বড়।

গ চিত্র-১ এ পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে বুঝানো হয়েছে।
পৃথিবী গতিশীল। পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ড বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। পৃথিবীর এই আবর্তন গতিকে আহ্নিক গতি বলে। পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর একবার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন। একে সৌরদিন বলে। উক্ত আহ্নিক গতির ফলে দিনরাত সংঘটিত হয় যা উদ্দীপকের চিত্র-১-এ দেখানো হয়েছে।
উদ্দীপকের চিত্রে এক পার্শ্বে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে এবং অন্য পার্শ্বে গ্লোব রাখা হয়েছে। গ্লোবের যে পার্শ্ব মোমবাতির দিকে সেখানে আলোকিত এবং বিপরীত পাশে অন্ধকার। আমরা জানি, পৃথিবী গোল এবং এর নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। আবর্তন গতির জন্য পৃথিবীর যেদিক সূর্যের সামনে আসে, সেদিক সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। তখন ঐ আলোকিত স্থানসমূহে দিন। আলোকিত স্থানের উল্টা দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর যেদিকটা সূর্যের বিপরীত দিকে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেদিকটা অন্ধকার থাকে। এসব অন্ধকার স্থানে তখন রাত্রি। এভাবে আহ্নিক গতির ফলে দিনরাত সংঘটিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র-১ এ পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ চিত্র-২ অনুযায়ী ২১ শে মার্চ 'A' স্থানে এবং 'B' স্থানে একই ঋতু বিরাজ করবে না। এ সময়ে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে ভিন্ন ধরনের ঋতু বিরাজ করবে।
২২ ডিসেম্বরের পর থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত পৃথিবী এমন অবস্থানে আসে যে, যখন সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে। ফলে ২১ মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। দিনের বেলায় সূর্যকিরণের কারণে ভূপৃষ্ঠের বায়ুস্তর গরম হয় এবং রাত্রিবেলায় বিকিরিত হয়ে ঠান্ডা হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তঋতু ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎ ঋতু বিরাজ করে।
চিত্র-২ এ A দ্বারা দক্ষিণ গোলার্ধ এবং B দ্বারা উত্তর গোলার্ধকে বুঝানো হয়েছে। ২১ শে মার্চ উত্তর গোলার্ধে বসন্ত ঋতু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎ ঋতু বিরাজ করবে।

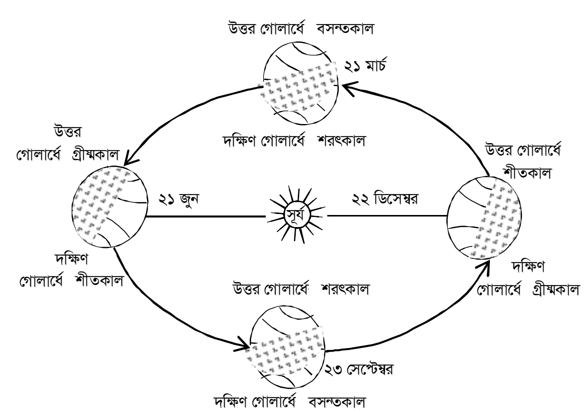

চিত্রে দেখা যায় যে, ২১ শে মার্চ পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে ভিন্ন ধরনের ঋতু বিরাজ করে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবী বা কোনো অঞ্চল বা এর অংশবিশেষকে কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কন করাকে মানচিত্র বলে।

খ সময় এবং বারের অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা আঁকাবাঁকা টানা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে কোথাও কোথাও বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ এ রেখাকে ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অনুসরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে টানা হলেও সাইবেরিয়ায় উত্তর-পূর্বাংশ এবং অ্যালিউসিয়ান, ফিজি এবং চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের স্থলভাগকে এড়িয়ে চলার জন্য এই রেখাটিকে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে ১১° পূর্ব দিয়ে বেঁকে এবং বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্বে বেঁকে শুধু পানির উপর দিয়ে টানা হয়েছে। তা না হলে স্থানীয় অধিবাসীদের বার নির্ণয় করতে ভীষণ অসুবিধা হতো। এমনকি একই স্থানের মধ্যেই সময় এবং বার দুই রকম হতো। তাই সময় এবং বারের অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা আঁকাবাঁকা টানা হয়েছে।

গ 'A' ও 'B' স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (১৭০°৩০′ – ১২৫°) পূর্ব
= ৪৫°৩০′ পূর্ব

আমরা জানি,
১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য = ৪ মিনিট
∴ ৪৫° " " " " = (৪ × ৪৫) মিনিট
= ১৮০ মিনিট বা ৩ ঘণ্টা

আবার,
১′ জন্য সময়ের ব্যবধান = ৪ সেকেন্ড
∴ ৩০′ " " = (৪ × ৩০) সেকেন্ড
= ১২০ সেকেন্ড বা ২ মিনিট

∴ সময়ের পার্থক্য ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট

যেহেতু 'A' স্থানের দ্রাঘিমা ১২৫° পূর্ব এবং 'B' স্থানের দ্রাঘিমা ১৭০°৩০′ পূর্ব সেহেতু 'B' স্থান 'A' স্থানের পূর্বে অবস্থিত।

সুতরাং 'A' স্থানের সময়ের সাথে ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট যোগ করে 'B' স্থানের সময় নির্ধারিত হবে।

অতএব, জাহাজটি যখন 'B' স্থানে পৌঁছায় তখন সেখানকার স্থানীয় সময় ছিল (সকাল ১১ টা + ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট) বা দুপুর ২ টা ২ মিনিট।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জাহাজটি 'B' (১৭০°৩০′ পূর্ব) অবস্থান থেকে ৫ ঘণ্টা পর 'C' (১৭৫° পশ্চিম) স্থানে পৌঁছায়। অর্থাৎ জাহাজটি ১৮০° দ্রাঘিমারেখা তথা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে।

১৮০° দ্রাঘিমারেখা পৃথিবীর পশ্চিম বা পূর্ব গোলার্ধের তারিখ বিভাজিকার (Date Separator) কাজ করে। তাই ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। পশ্চিমগামী জাহাজ এ তারিখ রেখা অতিক্রমকালে ঘড়ির সময় একদিন বাড়িয়ে নেয়। অর্থাৎ সেদিন সোমবার থাকলে মঙ্গলবার করে নেওয়া হয়। আবার পূর্বগামী জাহাজ এ রেখা অতিক্রম করলে সময় একদিন পিছিয়ে অর্থাৎ সোমবার থাকলে রবিবার করে নেওয়া হয়।

যেহেতু উদ্দীপকে বর্ণিত জাহাজটি পূর্বগামী এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে। তাই বলা যায়, জাহাজটির ঘড়িতে বার ও তারিখের পরিবর্তন হবে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাভাবিকভাবে ভাসমান মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানির ফোঁটা ফোঁটা আকারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে বৃষ্টিপাত বলে।

খ শীতপ্রধান এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নামলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পেঁজা তুলার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে তুষারপাত বলে।

গ উদ্দীপকের লাবণীর দেখা বৃষ্টিপাতটি হলো শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত এবং এটি শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমনপথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাধা পায় তাহলে ঐ বায়ু উপরের দিকে উঠে যায়। তখন জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং পর্বতের উঁচু অংশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward slope) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে। বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে আগত মৌসুমি বায়ু মেঘালয় পাহাড়ে বাধা পেয়ে বাংলাদেশের সিলেট এলাকায় প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প–২ এ লাবনী ছুটিতে বাবা-মায়ের সাথে পার্বত্য এলাকায় বেড়াতে গেল। বেড়াতে বের হতেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। সে অবাক হয়ে দেখলো পর্বতটির একপাশে বৃষ্টিপাত হচ্ছে কিন্তু অন্য পাশে হচ্ছে না। যা শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতকে নির্দেশ করে এবং এটি শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প–১ এ পরিচলন বৃষ্টিপাত এবং দৃশ্যকল্প–২ এ শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতকে বুঝানো হয়েছে। শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত আমাদের দেশের কৃষিকাজের জন্য অধিক উপযোগী।

দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে সোজা উপরে উঠে যায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয়বাষ্প প্রথমে মেঘ ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে সোজাসুজি নিচে নেমে আসে। এরূপ বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে (Equatorial region) স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের বিস্তৃতি বেশি এবং এখানে সূর্যকিরণ সারাবছর লম্বভাবে পড়ে। এ দুটি কারণে এখানকার বায়ুমণ্ডলে সারাবছর জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। জলীয়বাষ্প হালকা বলে সহজেই তা উপরে উঠে গিয়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে পরিচলন বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর প্রতিদিনই বিকেল অথবা সন্ধ্যার সময় এরূপ বৃষ্টিপাত হয়।

অন্যদিকে, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি মূলত পাহাড়িয়া অঞ্চলে সংঘটিত হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমনপথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাধা পায় তাহলে ঐ বায়ু উপরের দিকে উঠে যায়। তখন জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং পর্বতের উঁচু অংশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward slope) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে। বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময়ে হয়। যা ধান, পাট ও আখ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

সুতরাং বলা যায়, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত আমাদের দেশের কৃষিকাজের জন্য অধিক উপযোগী।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম ফ্যাদোমিটার।

খ বাংলাদেশের ৭১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরে রয়েছে অনেক সামুদ্রিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ। এর উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনসহ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জলজ প্রাণী ইত্যাদি রয়েছে।

কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় পারমাণবিক খনিজ জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রিওটাইল পাওয়া গেছে। এছাড়া সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে তেল, গ্যাস সম্পদ। তাই বঙ্গোপসাগরকে সামুদ্রিক সম্পদের এক বিশাল আধার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'M' চিহ্নিত ভূমিরূপটি সমুদ্র তলদেশের মহীসোপান অঞ্চলকে নির্দেশ করে।

পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। এরূপ সমুদ্রের উপকূলরেখা থেকে তলদেশ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপানের সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার। এটি ১° কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে।

মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা ৭০ কিলোমিটার। মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে। মহীসোপানের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়। উপকূলভাগের বন্ধুরতার ওপর এর বিস্তৃতি নির্ভর করে। উপকূল যদি বিস্তৃত সমভূমি হয়, তবে মহীসোপান অধিক প্রশস্ত হয়। মহাদেশের উপকূলে পর্বত বা মালভূমি থাকলে মহীসোপান সংকীর্ণ হয়। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান অবস্থিত। মহীসোপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকে বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'N' ও 'O' চিহ্নিত অঞ্চলদ্বয় যথাক্রমে গভীর সমুদ্রখাত এবং গভীর সমুদ্রের সমভূমি। উভয় ভূমিরূপের মধ্যে গভীর সমুদ্রখাত অধিক বৈচিত্র্যময়।

মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গড় গভীরতা ৫,০০০ মিটার। এ অঞ্চলটি সমভূমি নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধুর। কারণ গভীর সমুদ্রের সমভূমির ওপর জলমগ্ন বহু শৈলশিরা ও উচ্চভূমি অবস্থান করে। আবার কোথাও রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়গিরি। এ সমস্ত উচ্চভূমির কোনো কোনোটি আবার জলরাশির উপর দ্বীপরূপে অবস্থান করে। সমুদ্রের এ গভীর অংশে পলিমাটি, সিন্ধুমল, আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত লাভা ও সূক্ষ্ম ভস্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়।

অন্যদিকে, গভীর সমুদ্রখাত অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এসব খাতকে গভীর সমুদ্রখাত বলে। পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রখাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। এ প্লেট সীমানায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এসব খাত সৃষ্টি হয়েছে। এ খাতগুলো অধিক প্রশস্ত না হলেও খাড়া ঢালবিশিষ্ট। এদের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৪০০ মিটারের অধিক। প্রশান্ত মহাসাগরেই গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক। এর অধিকাংশই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ সকল গভীর সমুদ্রখাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত সর্বাপেক্ষা গভীর।

সুতরাং বলা যায়, গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং গভীর সমুদ্রখাত ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানীয় জলের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা বসতিকে আর্দ্র অঞ্চলের বসতি বলে।

খ সমরকন্দ নগরের উৎপত্তির কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নগর গড়ে উঠেছে। যেমন– নদী তীরবর্তী স্থানে নৌ-চলাচলের এবং সমভূমিতে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এরূপ স্থানগুলোতে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠেছে। মিসরের নীল নদের তীরবর্তী আলেকজান্দ্রিয়া ও তাজিকিস্তানের সমতলভূমিতে সমরকন্দ নগরের উৎপত্তি হয়েছে।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত বসতি হলো গোষ্ঠীবন্ধ বা সংঘবন্ধ বসতি।

গোষ্ঠীবন্ধ বা সংঘবন্ধ বসতিতে কোনো একস্থানে বেশ কয়েকটি পরিবার একত্রিত হয়ে বসবাস করে। এই ধরনের বসতি আয়তনে ছোট গ্রাম হতে পারে, আবার পৌরও হতে পারে। এই ধরনের বসতির যে লক্ষণ চোখে পড়ে তা হলো এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কম ও বাসগৃহের একত্রে সমাবেশ। সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই বাসগৃহগুলোর মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সমাজবন্ধ জীব মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে এবং নিরাপত্তার জন্য একত্রে বসবাস করতে চায়। এছাড়া ভূপ্রকৃতি, উর্বর মাটি ও জলের উৎসের ওপর নির্ভর করে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।
উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ রুমা তার বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখল, সেখানকার বাড়িগুলো খুব নিকটে এবং অধিবাসীদের মধ্যে সহমর্মিতা প্রবল। এসব বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীবন্ধ বা সংঘবন্ধ বসতিতে লক্ষ করা যায়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ আকাশ শহুরে বসতি এবং সিপন গ্রামীণ বসতি অঞ্চলে বাস করে। এদের মধ্যে আকাশের বসতি অঞ্চল অর্থাৎ শহুরে বসতি অঞ্চল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উপযুক্ত।
শহুরে বসতি সাধারণত অকৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত একটি অঞ্চলের সার্বিক দিকের উন্নয়নকে বোঝায়। শহর এলাকায় মানুষ কৃষিভিত্তিক পেশা পরিত্যাগ করে শিল্পভিত্তিক পেশায় আত্মনিয়োগ করে। শহর এলাকায় সেবামূলক কর্মকাণ্ড বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- শহরাঞ্চলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। শহর অঞ্চলের জনগোষ্ঠী শিক্ষাদীক্ষায় আধুনিক এবং এখানে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড তথা শিল্পায়ন দ্রুততর বৃদ্ধি পেতে থাকে, যে কারণে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিরাজ করে। তাই সেখানকার বসতিগুলোতে ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া শহরের মানুষ পাকা বাড়ি বা অট্টালিকায় বসবাস করে। অর্থাৎ শহরের বসতির মধ্যে উন্নত জীবনযাপন পরিলক্ষিত হয়।
অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষিকেই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল থাকে না। তাই এখানকার বসতিতে বিক্ষিপ্ত ধরনের কৃষিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তবে অনুন্নত জীবনযাপন ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যের কারণে স্থানভেদে বিক্ষিপ্ত রৈখিক, অনুকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীবন্ধ প্রভৃতি বসতি পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং আমি মনে করি, আকাশের শহুরে বসতি সিপনের গ্রামীণ বসতি অঞ্চলের মধ্যে শহরাঞ্চল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অধিক উপযুক্ত।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্প শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে।

খ পোশাক শিল্পকে 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প বলে।

পোশাক শিল্প থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প থেকে ৩৪৯৮ বিলিয়ন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানির ৮৬.২%। তাই বাস্তবিকই পোশাক শিল্প বিলিয়ন ডলার শিল্প।

গ গণি মিয়া প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে, প্রকৃতি এই বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। পশু শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই, পশুপালন, খনিজ উত্তোলন এবং কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। এ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দেখা যায়।

উদ্দীপকের গণি মিয়া একজন কৃষক। কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। তাই বলা যায়, গণি মিয়া প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

ঘ গণি মিয়ার বড় ছেলে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ছোট ছেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। দুই ছেলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছোট ছেলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জাতীয় উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখে।

তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে মানুষ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। গণি মিয়ার আইনজীবী বড় ছেলে সেবার দ্বারা জনগণকে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। এর ফলে অন্যায় অবিচার, দুর্নীতি হ্রাস পায়। দেশের সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

অপরদিকে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকের গণি মিয়ার ছোট ছেলে ভারী শিল্পের মালিক। এ শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জাতীয় উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখে। সুতরাং গণি মিয়ার দুই ছেলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছোট ছেলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জাতীয় উন্নয়নে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে।

খ বাংলাদেশের নদীগুলো ভরাটের কারণে পানিধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে নাব্যতা হারাচ্ছে।

বর্ষাকালে উজান থেকে আসা খরস্রোতা নদী পাহাড়ি পলি বয়ে নিয়ে আসে এবং নদীর তীরে ভাঙনের সৃষ্টি করে। ভাটিতে নদীর স্রোতের গতি কমে যায় তখন নদীগুলোর তলদেশে পলি সঞ্চিত হয়ে ভরাট হয় এবং ক্রমে নাব্যতা হারাচ্ছে।

গ উদ্দীপকের 'Z' দ্বারা গ্রীষ্ম ঋতুকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জৈষ্ঠ) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° সেলসিয়াস। গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। এপ্রিল উষ্ণতম মাস, এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উদ্দীপকের ছকের 'Z' ঋতুর তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস। যা গ্রীষ্ম ঋতুর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, 'Z' দ্বারা গ্রীষ্ম ঋতুকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ ছকে উল্লিখিত X ও Y হলো যথাক্রমে বর্ষা ও শীত ঋতু। বর্ষা ও শীত ঋতু ভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে এসময় অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। গড় তাপমাত্রা হয় ২৭° সেলসিয়াস। বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর শাক-সবজি যেমন– কাঁকরোল, করলা, ঢেঁড়শ, পুঁইশাক, ডাটাশাক ইত্যাদি চাষ করা হয়।

অপরদিকে, আমাদের দেশে শীত ঋতুতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস হয়। এসময় উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু আমাদের দেশে শৈত্যপ্রবাহের আগমন ঘটায়। এ ধরনের আবহাওয়ায় গম ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়। গম ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে তেলবীজ (তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি) এবং ডাল (মসুর, মুগ, মটর, মাসকলাই, খেসারি) এবং ভুট্টা, যব, আলু, সবজি, ফলমূল প্রধান।

সুতরাং বলা যায়, বর্ষা ও শীত ঋতু দুটি ভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে।

খ শীতকালীন শস্যকে রবি শস্য বলে। শীতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে একই শস্য আবাদ হয় বলে কৃষক মূল্য কম পায়। এ কমমূল্য রোধকল্পে করণীয় হলো–

১. চাষকৃত শস্যের বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. সরকার কর্তৃক শস্যের মূল্য নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
৩. কৃষককে সঠিক মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞান দানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. স্থানীয় কৃষকদের সমিতি সুসংগঠিত করতে হবে।

গ উদ্দীপকে শস্য-১ দ্বারা গম চাষকে বোঝানো হয়েছে।

সাধারণত গম চাষের জন্য উর্বর দোআঁশ মাটি, ১৬° থেকে ২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এ কারণে বাংলাদেশে বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে পানিসেচের মাধ্যমে গম চাষ ভালো হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গম চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে গম চাষ ভালো হয়।

উদ্দীপকের শস্য-১ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর উর্বর দোআঁশ মাটিতে শীত মৌসুমে গম ফসল চাষ হয়। ফসলটি পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদন ভালো হয়। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যায়, শস্য-১ এ গম চাষ হয়।

ঘ উদ্দীপকে শস্য-২ হলো পাট এবং শস্য-৩ হলো চা। নিচে পাট এবং চা-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো পাট, যা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করা হয়। এ ফসলটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। পাট দ্বারা চট, বস্তা, বেডিং বাঁধার চট, থলে, পাটের কাপড়, কার্পেট, কার্পেটের নিচের অংশ, দড়ি, শিকে টারউলিন, ক্যানভাস, পাকানো সুতা, সুতলি, ব্যাগ ও বস্ত্র, পাটের কম্বল, সতরঞ্জি, ফিতা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পাটজাত দ্রব্যাদি সুনাম অর্জন করেছে। পাট শিল্প স্থাপনের ফলে দেশের বেকার সমস্যা লাঘব হয়েছে। দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে পাটকলের সংখ্যা ২০৫। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিশর, কানাডা, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের পাট শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা।

অন্যদিকে চা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ চা রপ্তানিও করে থাকে। কিন্তু কর্মসংস্থান ও বাজার বিবেচনায় তা পাটের মতো ব্যাপক নয়।

সুতরাং শস্য-২ এ পাট এবং শস্য-৩ এ চা উৎপাদনকৃত ফসল দুটির মধ্যে শস্য-২ দেশের ও অর্থনীতিতে অধিক ভূমিকা রাখে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যখন জনগণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হয়, তখন জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করাকে আমদানি বলে।

খ দেশের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং পুরাতন বন্দর। এটি বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। এ বন্দরে সহজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্যবাহী জাহাজ মালামাল খালাস করতে পারে। যে কারণে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া এটি সমুদ্রের সাথে লাগানো এবং এখানকার নদীর পানির গভীরতা অনেকবেশি হওয়ায় সহজে ভারী মালামাল নিয়ে বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারে।

গ 'P' যাতায়াতের জন্য আকাশপথ ব্যবহার করবে।

বর্তমানে আকাশ পথকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ কল্পনাও করা যায় না। একদেশ হতে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য একমাত্র উপযুক্ত পথ হলো আকাশ। এর মাধ্যমে অতিদ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌছানো যায়। সড়ক বা নৌপথে একদেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াতের জন্য সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। যদি থাকেও তা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ। তাই নিজ দেশ থেকে ভিন্ন দেশে গমন করতে হলে আকাশপথের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের তিন বন্ধুর মধ্যে 'P' বন্ধু ঢাকা থেকে জাপানে বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছে। তার জন্য আকাশপথে যাতায়াত উত্তম হবে।

ঘ 'Q' নৌপথে স্বল্প খরচে বরিশালে বেড়াতে যেতে পারবে। কিন্তু 'R' কে সড়কপথে রংপুর বেড়াতে যেতে হবে, যা নৌপথের তুলনায় ব্যয়বহুল।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। এ পথে পরিবহণ খরচ খুবই কম। বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। বরিশাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। তাই 'Q' আরামদায়ক ভ্রমণে স্বল্প খরচে বরিশালে বেড়াতে যেতে পারবে।

অন্যদিকে রংপুর দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে যাতায়াতের উত্তম মাধ্যম হলো সড়কপথ। এ পথে যাতায়াতে ব্যয় বেশি। 'R' কে রংপুর বেড়াতে যেতে হলে সড়কপথেই অধিক ব্যয়ে বেড়াতে যেতে হবে।

সুতরাং 'Q' ও 'R' দুই বন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে 'Q' বেড়াতে পারবে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো এক আকস্মিক ও চরম প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ঘটনাকে বিপর্যয় বলে।

খ ভূমিকম্প সংঘটনের পরপরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের সাড়াদান কার্যক্রমটি শুরু করা প্রয়োজন।

সাড়াদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। ভূমিকম্পের পরপরই নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর ঘটনাটি ঘূর্ণিঝড়কে নির্দেশ করে।

প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং মারাত্মক ধ্বংসকারী বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় উল্লেখযোগ্য। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বমুখী বায়ুরূপে পরিচিত। এর কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিরাজ করে। বাংলাদেশে আশ্বিন-কার্তিক এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে এ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কারণে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে ফানেলাকার আকৃতির কারণে এ দেশে অধিকসংখ্যক ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়।

উপকূলবাসীকে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। দৃশ্যকল্প-১ এ উপকূলীয় অঞ্চলের ফারুক ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পর পরিবারসহ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এভাবে ব্যাপক মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ সংঘটিত দুর্যোগটি হলো নদীভাঙন।

উক্ত দুর্যোগটির প্রভাবে সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়– উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নদীভাঙন এ দেশের জন্য নিয়মিত সমস্যা বলা যায়। নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি চলমান প্রক্রিয়া বিশেষ। নদীভাঙনের ক্ষতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। তখন বন্যার করাল গ্রাসে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, জমি-জমা, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

এ দেশের প্রধান নদী ও শাখানদী দ্বারা কমবেশি নদীভাঙন প্রক্রিয়া চলে। দেশের প্রায় ১০০টি উপজেলায় নদীভাঙন সংঘটিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতে নদীভাঙনে জমির মালিকগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা কখনই আর সে জমি পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এ কারণে ভূমিহীন মানুষের স্থানান্তর ঘটে। এদের নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সুযোগ থাকে না। সেই সঙ্গে তারা সামাজিক মর্যাদাও হারায়। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের সাথী হয়ে শহরে নগরে ভাসমান মানুষে পরিণত হয়। সর্বোপরি সব কিছু হারিয়ে রেল রাস্তা ও বাঁধের উপর আশ্রয় নেয়। নদী ভাঙনে সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায় উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত দুর্যোগটির প্রভাবে সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয় কথাটি যথার্থ হয়েছে।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	N	২	K	৩	K	৪	L	৫	L	৬	L	৭	M	৮	K	৯	K	১০	N	১১	N	১২	M	১৩	M	১৪	M	১৫	M
১৬	K	১৭	M	১৮	K	১৯	M	২০	K	২১	M	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	K	২৬	L	২৭	K	২৮	L	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির জড় ও জীব উপাদান নিয়ে যে পরিবেশ তাকে ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ ভূগোলের যে শাখায় মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিষয়ক আলোচনা করা হয় তাই অর্থনৈতিক ভূগোল।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অর্থনৈতিক কাজ করে তা অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। এসব কাজ হলো কৃষিকাজ, পশুপালন, বনজসম্পদ, খনিজসম্পদ সংগ্রহ, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে ভূগোল ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় দুটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ভূগোল একদিকে প্রকৃতির বিজ্ঞান আবার অন্যদিকে পরিবেশ ও সমাজের বিজ্ঞান। প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান হলো ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর ভূমিরূপ, এর গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্পর্কে নিখুঁতভাবে ধারণা দেয় ভূগোল। আবার, পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব কাজ করে (যেমন– কৃষিকাজ, পশুপালন, বনজসম্পদ ও খনিজসম্পদ সংগ্রহ, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি। তার সুস্পষ্ট ধারণাও ভূগোল প্রদান করে থাকে। পৃথিবীর পরিবেশের সীমার মধ্যে থেকে মানুষের বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম চলছে সে সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাই ভূগোল।

অন্যদিকে নদী, নালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, ঘর, বাড়ি, রাস্তাঘাট, উদ্ভিদ, প্রাণী, পানি, মাটি ও বায়ু নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবেশ। এ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বর্ণনা করে থাকে ভূগোল। সুতরাং ভূগোল ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে ভূগোল ও পরিবেশ। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি পাঠের গুরুত্ব বিবেচনায় আরাফাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথেষ্ট যৌক্তিক।

উদ্দীপকে আরাফাত ভূগোলবিষয়ক জার্নাল পড়ে জানতে পারল যে, ভূগোল ও পরিবেশ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ভূগোল ও পরিবেশ হচ্ছে সকল প্রকৃতি বিজ্ঞানের জননী। ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব বহুবিধ।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন স্থানের প্রকৃতি ও পরিবেশ কেমন, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি, এদের গঠনের কারণ ও বৈশিষ্ট্য জানা যায়। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কীভাবে জীবগতের উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অর্জন করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং এদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারার বৈচিত্র্য জানা যায়। এটি পাঠে আমরা কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের সামাজিক পরিবেশের কী পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে পারি। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো কেন সৃষ্টি হয়, এদের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি এবং দুর্যোগ কী ক্ষতি করে তা ভূগোল ও পরিবেশ পাঠে জানা যায়। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও এর প্রভাব সম্পর্কে আমরা ভূগোল ও পরিবেশ পাঠে জানতে পারি। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে তাও জানা যায়। ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের মাধ্যমে সমুদ্র ও সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। উপরিউক্ত বিষয়াবলি পর্যালোচনা করে বলা যায়, ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই আরাফাতের ভবিষ্যতে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যৌক্তিক।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবী তার নিজের মেরুদন্ডের বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। পৃথিবীর এই আবর্তন গতিকে আহ্নিক গতি বলে।

খ যে বছর ফেব্রুয়ারি মাসকে ২৮ দিনের পরিবর্তে একদিন বাড়িয়ে ২৯ দিন ধরা হয়, সেই বছরকে অধিবর্ষ বলে।

একবার সূর্যকে পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে সৌরবছর বলে। কিন্তু আমরা ৩৬৫ দিনকে একবছর ধরি। এতে প্রতিবছর প্রায় ৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় থেকে যায়। এ অতিরিক্ত সময়ের সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রতি ৪ বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন বাড়িয়ে সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়। এভাবে যে বছর ফেব্রুয়ারি মাসকে ১ দিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হয় এবং ঐ বছরটিকে ৩৬৬ দিন ধরা হয়। সেই বছরকে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ বলে।

গ উদ্দীপকের স্থান দুটির সময়ের পার্থক্য = (রাত ১০.০০ − সকাল ৬.০০) = ৪ ঘণ্টা।

আমরা জানি,

১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট

∴ ৪ ঘণ্টা = (৪ × ৬০) মিনিট = ২৪০ মিনিট

প্রতি ৪ মিনিট সময়ের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য = ১°

১ " " " " " = $\left(\frac{১}{৪}\right)^\circ$

∴ ২৪০ " " " " " = $\left(\frac{১ \times ২৪০}{৪}\right)^\circ$ = ৬০°

সুতরাং, উদ্দীপকের স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্য ৬০° হবে।

ঘ উদ্দীপকের শিব্বিরের বন্ধুর চাদর মোড়ানোর কারণ হলো স্থান দুটির মধ্যে অক্ষাংশগত পার্থক্য।

সমগ্র পৃথিবীকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে। নিরক্ষরেখার উপরের দিকের অংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং নিচের দিকের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। অনুরূপভাবে উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শরৎকাল। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর গোলার্ধে। এখানে জুন মাসের দিকে গরম বেশি অনুভূত হয়।

এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে থাকা দ. আফ্রিকায় শীতকাল বিরাজ করে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় জুন মাসে শীতকাল হওয়ায় শিব্বিরের বন্ধু সেখানে চাদর মুড়িয়ে থাকে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট স্কেলে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাসহ কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের অঙ্কিত প্রতিরূপকে মানচিত্র বলে।

খ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিমাণগত মানচিত্রে প্রদর্শন করা যায়। পরিমাণগত মানচিত্রের মাধ্যমে বায়ুর উত্তাপ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জনসংখ্যার বণ্টন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, খনিজ উৎপাদন, বনজ উৎপাদন, শিল্পজ উৎপাদন প্রভৃতি পরিসংখ্যান তথ্যসমূহ দেখানো হয়।

গ উপরের চিত্রের 'B' মানচিত্রটি হলো ক্যাডাস্ট্রাল বা মৌজা মানচিত্র।

মৌজা মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ভূমি অথবা ভবনের মালিকানার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য। আমাদের দেশে আমরা যে মৌজা মানচিত্রগুলো দেখতে পাই সেগুলো আসলে ক্যাডাস্ট্রল মানচিত্র। এই মানচিত্রের মাধ্যমেই হিসাব করে সরকার ভূমির মালিক থেকে কর নিয়ে থাকে। এছাড়া এ মানচিত্রে নিখুঁতভাবে সীমানা দেওয়া থাকে। যার ফলে আমরা সহজেই একে অপরের সম্পত্তিকে শনাক্ত করতে পারি।

এই মানচিত্রগুলো বৃহৎ স্কেলে অঙ্কন করা হয়, যা ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল বা ৩২ ইঞ্চিতে ১ মাইল। এই ধরনের মানচিত্রের মধ্যে বিবিধ তথ্য প্রকাশ করা হয়। শহরের পরিকল্পনার মানচিত্রও এই মৌজা মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। মৌজা মানচিত্রে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে একে অপরের মধ্যে সীমানা নিয়ে মত পার্থক্য থাকে না। ফলে গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের লোকেরা ভূমি চাষ, ভূমির কর, ভবন নির্মাণ প্রভৃতি কাজে এ মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে থাকে।

ঘ উপরের 'A' মানচিত্রটি হচ্ছে দেয়াল মানচিত্র। দেয়াল মানচিত্রের বহুবিধ গুরুত্ব রয়েছে।

দেয়াল মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার জন্য। সারা বিশ্বকে অথবা কোনো গোলার্ধকে এই মানচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। দেয়াল মানচিত্রে আমাদের চাহিদা মতো একটি দেশ অথবা একেকটি মহাদেশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয় বড় অথবা ছোট স্কেলে। এই দেয়াল মানচিত্রের স্কেল ভূসংস্থানিক মানচিত্রের চেয়ে ছোট কিন্তু ভূচিত্রাবলি মানচিত্রের চেয়ে বড়।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের পাশাপাশি দেয়াল মানচিত্রে সারা বিশ্ব বা কোনো গোলার্ধকে অথবা একেকটি মহাদেশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, দেয়াল মানচিত্রের বহুবিদ গুরুত্ব রয়েছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাপ ও চাপের পার্থক্যের কারণে বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়, একে বায়ুপ্রবাহ বলে।

খ বাংলাদেশের দক্ষিণে সাগরের কারণে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর নিয়মিত প্রবাহিত হয়।

দিনের বেলায় স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় বলে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়; কিন্তু জলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় না বলে সেখানকার বায়ু উচ্চচাপযুক্ত হয়। ফলে তখন জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রবায়ু বলে। আবার রাত্রিকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল বলে স্থলভাগের বায়ু উচ্চচাপযুক্ত হয়। তখন স্থলভাগ থেকে জলভাগ বা সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থানের কারণে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তন।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের উপস্থিতির মাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে। যাকে আমরা গ্রিন হাউস প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করি। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। শিল্পায়ন, যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড় ও কৃষির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কারণে উল্লিখিত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রদর্শিত একটি ছবি দেখে ফাতিহা খুব মর্মাহত হয়। ছবিতে দেখা যায় ছোট একটি বরফের স্তূপে মেরু ভল্লুক তার বাচ্চাকে কাঁধে নিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। ক্যাপশনে লেখা ছিল–পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং অনেক প্রাণী হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল। সুতরাং বলা যায়, বিশ্ব উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আবহাওয়ার ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তনের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাস দায়ী। শিল্পায়ন, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড়, পারমাণবিক পরীক্ষা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কারণে বায়ুতে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কোনো ঋতুতে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক আচরণ করছে না।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত, ব্যাপক বন্যা, ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি জলবায়ুগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী কয়েকটি শহর ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বারিমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে।

খ হিমশৈলের সঙ্গে আঘাত লাগার কারণে টাইটানিক জাহাজ ডুবে যায়।

সাধারণত উষ্ণ স্রোতের গতিপথে জাহাজ চালানো নিরাপদ। কিন্তু শীতল স্রোতের গতিপথে জাহাজ চালানো নিরাপদ নয়। কারণ শীতল সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে যেসব হিমশৈল (Iceberg) ভেসে আসে সেগুলোর কারণে জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে। যেমন– যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ ১৯১২ সালে প্রথম যাত্রাতেই হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সমুদ্রে ডুবে যায়।

গ উদ্দীপকের 'R' চিহ্ন দ্বারা গভীর সমুদ্রের সমভূমিকে বোঝানো হয়েছে।

মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গড় গভীরতা ৫,০০০ মিটার। এ অঞ্চলটি সমভূমি নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধুর।

গভীর সমুদ্রের সমভূমির ওপর জলমগ্ন বহু শৈলশিরা ও উচ্চভূমি অবস্থান করে। আবার কোথাও রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়গিরি। এ সমস্ত উচ্চভূমির কোনো কোনোটি আবার জলরাশির ওপর দ্বীপরূপে অবস্থান করে। সমুদ্রের এ গভীর অংশে পলিমাটি, সিন্ধুমল, আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত লাভা ও সূক্ষ্ম ভস্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। এ সকল সঞ্চিত পদার্থ স্তরে স্তরে জমা হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'P' ও 'Q' চিহ্নিত ভূমিদ্বয় যথাক্রমে মহীসোপান ও মহীঢাল। এ দুটি ভূমিরূপের মধ্যে মহীসোপানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি বলে আমি মনে করি।

মহাদেশসমূহের চারদিকে সমুদ্রের উপকূল রেখা থেকে তলদেশের দিকে ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশই মহীসোপান। মহীসোপান অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। মহীসোপান অঞ্চলে মৎস্যের প্রচুর খাদ্য থাকায় এ অঞ্চলে মৎস্যের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। এর ওপর ভিত্তি করে মহীসোপান অঞ্চলে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের প্রসার ঘটেছে। এছাড়া এ অঞ্চল খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার হিসেবে গুরুত্ব বহন করে।

মহীসোপান অঞ্চলকে সমুদ্রতট বা সৈকত বলে। মানুষ আনন্দ ভ্রমণের জন্য সৈকতে যায় এতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়। সমুদ্রের এ অংশে বহু নুড়ি রয়েছে। এ নুড়িতে ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, সিসা, তামা, নিকেল, দস্তা ইত্যাদি বহু মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়।

মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদ সরবরাহের জন্য সমুদ্র তলদেশ বিপুল সম্ভাবনাময়। শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে খাদ্যের যোগান, খনিজ সম্পদের ভান্ডার হিসেবে পরিবহণ ও বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে মহীসোপান ও সমুদ্র নানাভাবে সহায়তা করে থাকে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বসতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত কৃষির ওপর নির্ভরশীল সেই বসতিকে সাধারণভাবে গ্রামীণ বসতি বলে।

খ মানুষ প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসতি গড়ে তোলে।

মরুময় অঞ্চলে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রথম ও প্রধান চাহিদা বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। সেখানকার মানুষ নির্দিষ্ট জলপ্রাপ্যতার স্থানে ঝরনা বা প্রাকৃতিক কূপের চারদিকে কয়েকটি পরিবার একত্রিত হয়ে বসবাস করে। তাই মরুময় অঞ্চলে মানুষ সংঘবদ্ধ বসতি গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-৩ এ দিগন্তের বসবাসকৃত এলাকায় রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে।

রৈখিক ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো একই সরলরেখায় গড়ে ওঠে। প্রধানত প্রাকৃতিক এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক কারণ এ ধরনের বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীর কিনারা, রাস্তার কিনারা প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। মূলত বন্যামুক্ত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর বসতির ধরন হলো বিক্ষিপ্ত বসতি ও গোষ্ঠীবন্ধ বসতি। এ দুটি বসতির ভিন্নতার কারণ হিসেবে ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা প্রধানত দায়ী। নিচে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি বিশ্লেষণ করা হলো–

বিক্ষিপ্ত বসতির স্থানে পানীয় জলের অপ্রাপ্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত, ক্ষয়িষ্ণু ভূমি প্রভৃতি সমস্যা বসবাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের বসতিতে দুটি বাসগৃহের মধ্যে ব্যবধান বেশি হয় এবং সেখানকার ভূপ্রকৃতি বন্ধুর। উঁচু-নিচু ভূমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ ও ফসল চাষাবাদ করা কষ্টসাধ্য হওয়া মূলত বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। এছাড়া জলাভূমি ও বিল অঞ্চল, বনভূমি এবং অনুর্বর মাটি এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করে।

অন্যদিকে গোষ্ঠীবন্ধ বসতিতে সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে বাসগৃহগুলোর মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ধরনের বসতিতে দুটি বাসগৃহের মধ্যে দূরত্ব কম থাকে এবং বাসগৃহের একত্রে সমাবেশ ঘটে। জলের উৎসের প্রাপ্তিতা ও মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে গোষ্ঠীবন্ধ বসতি গড়ে ওঠে। সমাজবন্ধ জীব মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে এবং নিরাপত্তার জন্য একত্রিত হয়ে বসবাস করতে গোষ্ঠীবন্ধ বসতিতে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করে।

সুতরাং গঠনগত ভূপ্রকৃতির কারণে বিক্ষিপ্ত ও গোষ্ঠীবন্ধ বসতিতে ভিন্নতা দেখা দেয়।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় তাই সম্পদ।

খ ইঞ্জিনের গাড়ি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত।

বৃহৎ শিল্পে ব্যাপক অবকাঠামো, প্রচুর শ্রমিক ও বিশাল মূলধনের প্রয়োজন হয়। যেমন– লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিমান শিল্প প্রভৃতি। বৃহৎ শিল্পে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। বৃহৎ শিল্প সাধারণত শহরের কাছাকাছি স্থানে গড়ে ওঠে।

গ জাফর প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে। প্রকৃতি এই বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। পশু শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই, পশুপালন, খনিজ উত্তোলন এবং কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

উদ্দীপকে জাফর ধান ও গমের চাষ করেন। তিনি কৃষিকার্যের বীজ বপন করেন, প্রকৃতি এ বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। সুতরাং, বলা যায় জাফর প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

ঘ অনিক ও কবিরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একই ধরনের নয়। অনিক দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং কবির তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। যেমন– খনিজ লৌহ আকরিক উত্তোলন করে তা থেকে লোহাশলাকা, পেরেক, টিন, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ দ্রব্যটির গঠন ও আকার পরিবর্তন করে উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়।

অন্যদিকে তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, পরিবেশক, এজেন্ট, ব্যাংকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, আইনজীবী, ধোপা, নাপিত, রিকশাচালক ও ঠেলাগাড়িওয়ালা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার জনসমষ্টির কার্যাবলি তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে অনিক ঢাকায় একটি বিস্কুটের কারখানার শ্রমিক। এখানে প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন ও আকার পরিবর্তন করে উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়। যা দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, কবিরের একটি দোকান আছে, যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের খুচরা জিনিসপত্র বিক্রয় করেন। এ ধরনের কাজ হলো তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তাই বলা যায়, অনিক ও কবিরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একই ধরনের নয়।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

খ বাংলাদেশে মার্চ-এপ্রিল মাসে সংঘটিত হওয়া বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়ের নাম কালবৈশাখী ঝড়, যা গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে। গ্রীষ্মকালে উত্তর দিক থেকে আগত শীতল বায়ু এবং দক্ষিণ দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম উষ্ণ এ আর্দ্র বায়ুর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কালবৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-৩ এ রনি সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি ভ্রমণ করেছে।

সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোট-বড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমতলভূমির ওপর দিয়ে এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের রনি ভ্রমণ শেষে এসে জানাল যে, সেখানে কোনো উচ্চভূমি দেখা যায় নাই। মাটি খুবই নরম, প্রচুর বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায়। খাদ্যশস্য উৎপাদনই বেশি। যা বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের জনি ও রনির দেখা অঞ্চলদ্বয় যথাক্রমে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ। টরিশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ অঞ্চলে টিলা দেখা যায়।

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। এখানকার পাহাড়সমূহের অধিকাংশই সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

আর, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহের অন্তর্ভুক্ত বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বে গঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বরেন্দ্রভূমি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।

পরিশেষে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ জনির দেখা অঞ্চল টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং দৃশ্যকল্প-২ এ রনির দেখা অঞ্চল প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ। উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাদৃশ্য নেই।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষা করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে।

খ পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়।

পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা (২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস) এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের (১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার) প্রয়োজন হয়। এ ধরনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত উষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়। তাই পাটকে উষ্ণ অঞ্চলের ফসল বলা হয়।

গ ছকে 'C' চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি।

বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে– (ক) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি; (খ) দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বরেন্দ্র বনভূমি অবস্থিত। শীতকালে এ বনভূমির বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। গ্রীষ্মকালে আবার নতুন পাতা গজায়।

এ বনভূমি অঞ্চল শাল, গজারি, কড়ই, হিজল, বহেরা, হরতকী, কাঠাল, নিম প্রভৃতি বনজ, সম্পদে সমৃদ্ধ।

উদ্দীপকের 'C' চিহ্নিত অঞ্চলে গজারি ও কড়ই গাছের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং 'C' চিহ্নিত অঞ্চলটি বাংলাদেশের ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনভূমির অন্তর্গত।

ঘ ছকে 'D' চিহ্নিত বনভূমিটি হলো সুন্দরবন যা স্রোতজ বনভূমি নামেও পরিচিত। সুন্দরবন বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য বনভূমি যা পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় স্থান। নিচে এর সপক্ষে মতামত তুলে ধরা হলো–

সুন্দরবন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এ বনভূমি সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় অবস্থিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী। নয়ন ভোলানো বনভূমির সৌন্দর্য দেখার জন্য শুধু দেশের মানুষ নয় বিদেশি বহু পর্যটকও ছুটে আসে। সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ ছাড়াও রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানরসহ বিভিন্ন প্রাণীর বসবাস। পশু, পাখি, উদ্ভিদ, নদী, লেক প্রভৃতির সমন্বয়ে সুন্দরবন যেন এক অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য। প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক সুন্দরবন পর্যবেক্ষণে আসেন। শুধু তাই নয় বিশ্বের বহু পর্যটন স্থানের মধ্যে সুন্দরবন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

সুতরাং যথাযথ পরিকল্পনা, সরকারি বেসরকারি সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নানারূপে সজ্জিত আমাদের সুন্দরবনকে যদি আরো আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা যায় তবে এ শিল্পের গুরুত্ব আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, 'D' চিহ্নিত বনভূমি অর্থাৎ সুন্দরবন পর্যটন শিল্পের এক অপার সম্ভাবনাময় স্থান।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল সম্পদ একবার ব্যবহার করার পর তার যোগান শেষ হয় না তাকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।

খ বাংলাদেশ প্রধানত গঠনগত কারণে ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের উত্তরে আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, হিমালয়ের পাদদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ভূমিকম্প প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। এছাড়াও রয়েছে ভূ-গাঠনিক গতিময়তা। সামগ্রিক দিক হতে দেখা যায় বাংলাদেশ ক্রমেই ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত অঞ্চলটি বরিশাল অঞ্চল। এ অঞ্চল থেকে ঢাকায় ব্যবসায়িক পণ্য পরিবহনে নৌপথ ব্যবহার করা অধিক সুবিধাজনক।

নিম্নভূমি সহজে বন্যাকবলিত হয়, ফলে সড়কপথ ও রেলপথ গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য সিলেট অঞ্চলের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের ফরিদপুর, ভোলা, মাদারিপুর, বরিশাল অঞ্চলে নৌপথ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবেই নদীবহুল অঞ্চলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সহজে গড়ে ওঠে না। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথই বেশি ব্যবহৃত হয়।

বরিশাল অঞ্চল মেঘনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মেঘনার সাথে ঢাকার শীতলক্ষ্যার মাধ্যমে নদীপথের সংযাগে রয়েছে। যার কারণে সহজেই বরিশাল হতে ব্যবসায়িক পণ্য ঢাকায় পরিবহনের জন্য নৌপথ ব্যবহার করা যায়।

ঘ 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলদ্বয় হলো খুলনা ও চট্টগ্রাম। এ দুই অঞ্চলের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলটি অধিক ভূমিকা রাখে।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং পুরাতন বন্দর। এটি বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। এ বন্দরে সহজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্যবাহী জাহাজ মালামাল খালাস করতে পারে। যে কারণে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া এটি সমুদ্রের সাথে লাগানো এবং এখানকার নদীর পানির গভীরতা অনেকবেশি হওয়ায় সহজে ভারী মালামাল নিয়ে বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারে।

মংলা সমুদ্রবন্দর এটি বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর। এটি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির ১৩ শতাংশ এবং আমদানির ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

সুতরাং 'B' ও 'C' অঞ্চলদ্বয়ের অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'B' অঞ্চল অধিক ভূমিকা রাখে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগ হচ্ছে এমন একটি ঘটনা, যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

খ এমডিজি অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০১৫ সাল পর্যন্ত যে সুনির্দিষ্ট ৮টি লক্ষ্যকে বেধে দিয়ে জাতিসংঘ কাজ করছে তা অর্জনে বাংলাদেশসহ অনেক দেশই সফল।

এমডিজির লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, লিঙ্গাবৈষম্য, শিশুমৃত্যু, মাতৃস্বাস্থ্য, রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণে রাখা টেকসই পরিবেশ প্রভৃতি। বাংলাদেশ এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। তন্মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে ও কর্মসংস্থানে বিভিন্ন প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে এবং ১০০% শিক্ষা ব্যবস্থায় সাফল্য অর্জনের চেষ্টা চলছে। এভাবে এমডিজি বাস্তবায়নে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করে যাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে 'A' বলতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির কথা বলা হয়েছে। এমডিজি থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড়। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। সবাই পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জনও সম্ভব হবে। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্য, ১৬৯টি টার্গেট রয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এর কার্যক্রম শুরু এবং সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গাবৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এসব ক্ষেত্রে কাজ করেছে। সবাই সচেতন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করা, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, বৈষম্য দূর করা ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী তরুণ। বিশাল তরুণ সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। আগের দিনে পুরুষের স্বাস্থ্য বেশি গুরুত্ব পেত। কিন্তু বুঝতে হবে নারী সুস্থ না হলে পরিবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সন্তান সুস্থ থাকবে না। খাবার স্বাস্থ্যসম্মত হবে না। তাই নারীর সুস্থতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ ছাড়াও আরো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা এসডিজির বাস্তবায়নে প্রয়োজন তা হলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লক্ষ্যগুলো ঠিক করে সংশ্লিষ্ট সবাই একসঙ্গে কাজ করলে নিশ্চয়ই এমডিজির মতো এসডিজিতেও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

ঘ উদ্দীপকের 'B' বলতে উন্নত দেশের স্বপ্ন অর্থাৎ ভিশন-২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। উক্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা আলোকপাত করা হলো–

সর্বপ্রথম ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করাতে হবে। বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং সংঘাতে পরিপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জগুলো যৌথভাবে মোকাবিলা করা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার সুরক্ষা করা এবং উদ্ভাবনী ধারণা এবং পদক্ষেপের ব্যবহার করে সহযোগিতার নতুন উদ্দীপনা জোরদার করা।

এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করা। দলগত কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করে অর্থনীতিকে উদ্ভাবনী চর্চার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্মানের ওপর ভিত্তি করে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। এশীয় দেশগুলোকে আন্তরিকভাবে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে– অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে সমতা, অংশীদারিত্ব এবং যৌথ অনুদানের ভিত্তিতে। আবার আন্তর্জঅতিক ধারাবাতিকতা এবং আন্তর্জঅতিক ক্ষেত্রে সবার জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই এবং সমতাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে।

সুতরাং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের স্বপ্ন দর্শনে যেসব পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তাসহ আরো সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশও উন্নত দেশের দ্বারপ্রান্তে চলে যাবে বলে আমি মনে করি।